লিলিডোনা এবং একটি শূন্য চেয়ার

কাজী জহিরুল ইসলাম

লিলিডোনার সাথে আব্দুল মতিনের সম্পর্কটা খুবই রহস্যজনক। এমনতো না যে পার্ভার্টেড পুরুষের আনাগোনা নেই সমাজে। লিলিডোনা যেন পাথরে ফোটা একগুচ্ছ রডেডেনড্রন ফুল। বয়স এগার। সবসময় কড়া রঙের ড্রেস পরে। স্কুলের মাঠে ও যখন বন্ধুদের সাথে ছোটাছুটি করে তখন আর সকলের চেয়ে ও যে আলাদা একজন, এটা সবারই চোখে পড়ে। তখনি আব্দুল মতিন, ৫৯ বছরের বাঙালী পুরুষ, অফিসের কাজকর্ম ফেলে ছুটে যায় স্কুলের মাঠে। পোজরান স্কুলের মাঠের উল্টোদিকে, মানে যেদিকে স্কুলঘরটি দাঁড়িয়ে আছে তার উল্টোদিকে, মাঠ পেরিয়ে রাস্তার ওপর সমান্তরাল তিনটা বটগাছ। বটগাছের ছায়ায় ভোটার রেজিস্ট্রেশন সেন্টারের লোকজন লাঞ্চ ব্রেক-এ এসে জিড়োয়। এদের দলনেতা আব্দুল মতিন। অন্যরা যখন বটগাছের ছায়ায় বসে বোরেক আর ফাফারোনিতে বড় একটা বাইট দেয়, আব্দুল মতিন তখন লিলিডোনার হাত ধরে। আদরে বা স্নেহে ওর কপালে চুমু খায়। তারপর ওকে টানতে টানতে নিয়ে যায় স্কুলঘরের পেছনে, ছোট্ট একটা গ্রোসারী শপে। ওকে মার্স কিনে দেয়, বাউন্টি কিনে দেয়। লিলিডোনা হাসে, ভোরের ঝলমলে আলোর মতো হাসি। তখন ওদের স্কুল ছুটি হয় কিন্তু লিলিডোনা বাড়ি যায় না। রেজিস্ট্রেশন সেন্টারের ভেতরে ঘুরঘুর করে। যখন সেন্টারে কোন ক্লায়েন্ট থাকে না, আব্দুল মতিন ভিডিও ক্যামেরায় লিলিডোনার ছবি তোলে। লিলি হাসে, মুখ বাঁকা করে, জিভ বের করে, ঠোঁঠ বাঁকায়, ঘাড় কাঁত করে, পা শূন্যে তোলে, কারো কাঁধে হাত রাখে, আরো কতোভাবে ছবি তোলে। আব্দুল মতিন হেসে গড়াগড়ি যায়। হাসে অন্যরাও। লিলি হয়ে ওঠে পোজরান রেজিস্ট্রেশন সেন্টারের সবচেয়ে আপনজন।

রাত তখন নয়টা। দশটা থেকে কার্ফিউ। আব্দুল মতিন হঠাৎ আমার রুমে এসে বলে, চলেন বাইরে যাই, একটু ঘুরে আসি। আমি বলি, এই কার্ফিউর মধ্যে? মতিন এসব মানে না। বলে, কার্ফিউতো আমাদের জন্য না। আমাদের ইউএন আইডি আছে না? আমরা বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু কোথায় যাবো? আমরা একটা ট্যাক্সি নেই। ট্যাক্সি এসে থামে পোজরান হাইস্কুলের মাঠে। জ্যোৎস্না রাত। আমরা বটগাছের নিচে বসে পড়ি। মে মাসের রাতেও কুয়াশা পড়ে কসোভোতে। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে পরীর দল নেমে আসছে পোজরান হাইস্কুলের মাঠে। খা খা মাঠ। ওপারে নিঃসঙ্গ একটি স্কুলঘর। এপারে বটগাছের নিচে নিঃসঙ্গ দুই পুরুষ। মতিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আমি বলি, চলেন ফিরে যাই। কার্ফিউ শুরু হলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। মতিন ওঠে না। যেন ও বটগাছের নিচে গজানো ছোট একটি গাছ। আরো দু'তিনটি শেকড় ছেড়ে দেয় মাটিতে। এমন সময় টর্চের আলো পড়ে আমাদের ওপর। বন্দুকের নলে বাঁধা টর্চ। টর্চের আলোয় আমাদের কিম্ভুত কিমাকার দুটি ছায়া তৈরী হয়, এক মূহুর্তের জন্য। আবার তা মিলিয়ে যায়, আবার সেই আগের মতো। বটগাছের ছায়ার সাথে মিশে যায় চাঁদের আলোয় তৈরী হওয়া আমাদের ভূতুড়ে ছায়া। আমি ওঠে দাঁড়াই। ইউএস কেফোরের একটি এপিসি থেমে আছে রাস্তার মোড়ে, হেসাতের দোকানের কাছে। রাস্তার আলো নেভানো। চাঁদের আলোয় কয়েকজন পথচারী। লক্ষহীন, গন্তব্যহীন। ওরা এপিসি থেকে নেমে এসেছে। দু'জনের হাতেই কালাশনিকভ। মার্কিনীরা ওদের শত্রুর দেশের অস্ত্র ব্যবহার করে কেন? একটি কুকুর ডাকে দূরে। কু উঁ উঁ উঁ। কুকুরেরা অধশব্দ শুনতে পায়। অধশব্দ করে বিপদ আসে। সেই শব্দ মানুষ শুনতে পায় না। মানুষ শুনতে পায় পূর্ণ শব্দ। বিপদ ঘটে গেলে পূর্ণশব্দ হয়। মানুষ সমূহ বিপদ টের পায় না। কুকুরেরা পায়। একটি স্ট্রীট ডগ ক্রমাগত ডেকে চলেছে। সামনে বিপদ। মতিনের কলার চেপে ধরে ইউএস আর্মি। সিমেন্টের ভাঙা বেঞ্চের ওপর থেকে ওকে টেনে তোলে। দ্বিতীয়জন কালাশনিকভের ব্যারেল ঠেকায় ওর কপালে। মতিন জ্বীনগ্রস্ত

মানুষের মতো বলে, লিলিডোনা। তখনি আমি খেয়াল করি যে সৈনিকটি ওর কপালে ব্যারেল ঠেকিয়েছে সে একটি মেয়ে। ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। দিশা না পেয়ে তাড়াতাড়ি মতিনের বুক থেকে আইডি ছিঁড়ে তুলে ধরি সবুজ হেলমেট পড়া কেফোরের সামনে। সাথে আমারটিও।

পরদিন। রোববার। আজ আমাদের কাজ নেই। মতিন ছটফট করছে। আমি ড্রাইভ করতে জানি না। মতিন জানে, ইউএন লাইসেন্সও আছে কিন্তু এই পাহাড়ি দেশে চালায় নি কখনো। আমাদের অফিশিয়াল গাড়ি এবং ড্রাইভার দুটোরই আজ ছুটি। আমাদের মধ্যে একমাত্র জাহিদ হায়দারের ইউএন গাড়ি আছে। জাহিদ রাজী হয়ে গেল। সেকেন্ড সীটে আমি উঠে বসলাম। আর কেউ যাবে না। বোখারী, খুরশিদ যাবে অন্য কোথাও, রবির আনন্দে মেতে উঠবে ওরা আজ। বাসাটা মনে আছেতো? স্কুলের পেছনেইতো। মতিনের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। এই লোকটি অবসেসড। লিলির প্রতি ওর কিসের এতো মমতা। পার্ভারশন। মতিনের সুবাদে আমরাও একবার গিয়েছিলাম। বুরেক আর ফেতাহ চিজ খেতে দিয়েছিল ওর মা। লিলির বাবা বেকিম হাইরুল্লাহু, খুব দরিদ্র, ঘড়ির মেকানিক। বেকিমের বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। শতবছরের পুরোনো একটি ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে লোকটা। মেলানোই যায় না, এই লোকটি লিলিডোনার বাবা। জীবন্ত একটি মেয়ে। টগবগ করে ফুটছে। ও যখন স্কুলের মাঠে দৌড়ায় ওর সোনালী চুল দ্রুতগামী অশ্বের লেজের মতো দুলতে থাকে। মেয়েটির যেন কোন ছায়া নেই, আলো ওর শরীর ভেদ করে চলে যায়। একখন্ড কাচ। না ভুল হলো, একখন্ড হিরা। সেই হিরায় মতিনের হাত কাটবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের পরিবারটিকেও আমি বুঝতে পারি না। মতিনকে সেদিন ওর বাবা নিজের মুখেই বললো, তুমি লিলিডোনাকে নিয়ে যাও তোমাদের দেশে। এ কথার মানে কি?

স্কুলের পেছনে গাড়ি পার্ক করলো মতিন। লিলিদের গেটের সামনে একটি খালি চেয়ার। চেয়ারের ওপর তুষারের আবরণের মতো একটি শাদা তোয়ালে। পাটাতনের ওপর একটি কাচের ফুলদানী। একগুচ্ছ তাজা গোলাপ তাতে সাজানো। বাহ, দারুণ ওয়েলকাম। মতিনের গাল ছড়িয়ে পড়ে, রোমান্টিক হাসিতে ও উদ্ভাসিত। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারি কি মস্ত বড় ভুল করেছি আমরা। বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন সমস্ত বাড়ি। কারো মুখে হাসি নেই। উচ্ছল প্রাণবন্ত কিশোরীটি কুঁকড়ে গেছে। ওর চোখের কোণে ক্রমাগত জমা হতে থাকা অশ্রু শুকিয়ে কালো দাগ পড়ে গেছে। লিলির মা মতিনকে দেখে হঠাৎই যেন ঢুকরে কেঁদে উঠলো। গতকাল বেকিম মারা গেছে। লিলিডোনার কাছেই জানতে পারি অনেকদিন ধরে বেকিম অ্যাবডোমিনাল ক্যানসারে ভূগছিলো। ওই যে বাইরের একটি খালি চেয়ার। ওটা তিনদিন থাকবে। এ বাড়ির একটি আসন খালি হলো। একটি শূন্য চেয়ার সেই শূন্যতারই প্রতিনিধিত্ব করছে। এটাই আলবেনিয়ান সমাজের রীতি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৫ আগস্ট, ২০০৬